বাগবাজার, গেঁজেল পক্ষী, ও এক আলেম সাহেব

ডঃ অরুণাভ সেনগুপ্ত

সিরাজদৌল্লা মরে ভূত হয়েছেন ষাট সত্তর বছর আগে, কলকাতা বড় হয়ে উঠছে। চৌরঙ্গীর দক্ষিণে হোয়াইট টাউন আর উত্তরে ব্ল্যাক টাউন যেখানে শিমলে, পাখুরেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শোভাবাজার জুড়ে বাবুদের বাড়ি। সম্বৎসর দোল , দুর্গোৎসব , যাত্রা, থ্যাটার, রক্ষিতা, মোসাহেব মদে অঢেল পয়সার খরচ। সে বৃত্তের একটু বাইরে, কম রেস্তয় নেশা করা যুবকদের ভিড় গাঁজার ঠেকে। তিনটে ঠেক খানদানি। বউবাজার, বটতলা, আর যার নামে বাগবাজারে রাস্তা আছে দুঁদে ব্যবসায়ী সেই দুর্গাচরন মুখুজ্যের ছেলে শিবচরন মুখুজ্যের তৈরি বাগবাজার ঠেক। ঠেকের খানদানি নেশারুরা গাঁজার ধোঁয়ায় উড়তে থাকেন বলে তাঁদের নাম ‘পক্ষী’, একাসনে বসে ১০৮ ছিলিম টানতে পারেন। বিভিন্ন পক্ষীর নামে এক এক জনের নাম, তিনি সেই পক্ষীর মতই পোশাক পরেন, সে পাখির ডাক ডাকেন। পক্ষীরা অবশ্য সবাই ফেলনা নয়। রূপচাঁদ পক্ষী যেমন, যেমন টপ্পা গায়ক নিধু বাবু। তিনি আবার পক্ষীরাজ। ছড়াগানে, রঙ্গরসে, পাঁচালী, খেউরে কলকাতাকে জমিয়ে রেখে তাঁরা নিজের মেজাজে চলতেন। একবার মহারাজা গোপীমোহন দেবের বিশেষ আমন্ত্রণে তাঁরা যেতে রাজি হয়েছিলেন এই শর্তে যে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা খাঁচা পাঠাতে হবে। কিন্তু তাঁদের মাত্রাতিরিক্ত অশ্লীল আদিরসাত্মক শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার ১৮৪০-৫০ নাগাদ ইংরেজি শেখা কলকাতার নব জাগ্রত ভদ্র সমাজে ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে গেল। ‘আমি ভোলা ময়রা হরুর চেলা, বাগবাজারে রই’ ইত্যাদি কবিয়ালের কবিগান, হাফ আখড়াই থেকে গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু, রামকৃষ্ণ, সারদা মা, বোসবাড়ি, রিডিং লাইব্রেরি, হয়ে যুগান্তর আনন্দবাজারের সংস্কৃতিতে ধীরে রূপান্তরিত বাগবাজারে রয়ে গেল খালি জেলে পাড়ার সং, আর দশহরা থেকে নীলষষ্ঠী, ইতু পূজা থেকে রামনবমী, দিনের বেলায় সদা সরগরম গঙ্গার ঘাটে রাতের অন্ধকারে গেঁজেলদের আড্ডা। হুতুমের ভাষায় পুরান আড্ডার ‘রুইন’ মাত্র। সেই গাঁজার ঠেকে এক আলেম বা এলেমদার সাহেব এলেন কোথা থেকে?

যিনি এলেন তিনি যেমন তেমন সাহেব নয়। তিনি ১৮৩৬ এ কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় প্রথম রসায়ন, ফার্মাকোলজি, ফরেনসিক মেডিসিনের শিক্ষক, ভৌত থেকে ভেষজ, বহুজ্ঞ বিজ্ঞানী, এদেশে আসা বিদেশী চিকিৎসকদের মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন খোদ ডঃ উইলিয়াম ব্রুক ও’শনেসি। আইরিশ ও’শনেসি ২০ বছর বয়সে ডাক্তারি পাস করার পর লন্ডন শহরে ডাক্তারি করার অনুমতি না পাওয়াতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ১৮৩৩এ যখন ভারতে এলেন তখন তাঁর বয়স ২৩। এই তিন বছরেই তাঁর টুপিতে অনেক পালক যার মধ্যে সবচেয়ে রংদার ১৮১৭ সালের যশোরের এশিয়াটিক কলেরার, যা ততদিনে পায়ে পায়ে হেঁটে দুনিয়া জুড়ে মহামারী ঘটাচ্ছে, চিকিৎসায় ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন চিকিৎসার প্রস্তাবনা। ভারতে এসে তাঁর প্রধান কাজ হল কবিরাজি হাকিমি দাওয়াখানা থেকে দেশীয় গৃহস্থের হেঁশেল, আয়ুর্বেদের প্রাচীন পুঁথি থেকে বন বাদার সর্বত্র ঢুঁ মেরে নতুন ওষুধের বা দামি বিলাতি ওষুধের সস্তা দেশীয়

বিকল্প খোঁজা। বিলাতি হাঁসপাতালে তখন শল্যচিকিৎসার দস্তুর ছিল রুগীকে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ খাইয়ে, হাত পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে বিদ্যুৎবেগে অপারেশন করা। ফলত চিকিৎসকরা নিয়ত খোঁজে থাকতেন বেদনহর কোন ওষুধের যা সাময়িক ভাবে ব্যথা বেদনার অনুভব কমাতে পারে। গঞ্জিকাসেবীদের তূরীয় অবস্থা দেখে ও'শনেসীর মনে হল গাঁজার মধ্যে সে ওষুধ পাওয়া যেতে পারে। হাকিমি আয়ুর্বেদ জানা বিখ্যাত পণ্ডিতদের সাহায্যে শাস্ত্র ঘাঁটাও ছাড়া গঞ্জিকাসেবীদের প্রত্যক্ষ সুলুক সন্ধানে উত্তর কলকাতার গাঁজার ঠেকে হাজির হলেন তিনি। ও অঞ্চলে ও'শনেসীর গাইড হলেন আমীর নামে কোন এক গাঁজা বিশারদ। গাঁজা দুনিয়া ঘুরে আমীর অ'শনেসীকে গাঁজা, চরস, ভাং, সিদ্ধি প্রস্তুত ও সেবনের রকমারি কায়দা শিখিয়েছিলেন। এক রুপোর টাকার সমওজনের ১৮০ গ্রেন গাঁজায় তিনজন নেশা করতে পারতেন। গাঁজার সাথে শুকন তামাক পাতা হাতে গুড়ো করে কয়েক ফোঁটা জল দেওয়া হত। ছিলিমে প্রথমে শুকন তামাক দিয়ে তাঁর উপরে সেই গাঁজার আস্তর, শেষে আবার শুকন তামাক পাতা দিয়ে তাতে আগুন দেওয়া হত। পালা করে ছিলিমে টান দিতেন নেশারুরা। সবচেয়ে বিশদ প্রণালী ছিল 'মাজুন' তৈরির। ভাং, ঘি, দুধ, ময়দা, বা দরকার মত অন্য কোন ফলের বীজ মিশিয়ে কাঠকয়লায় জ্বাল দিয়ে তৈরি হত 'মাজুন' যার বড় খদ্দের ছিল কালা ফিরিঙ্গীরা বা কিছু ঘরের মহিলারা। নিজের রুগী এমনকি ছাত্রদের উপড়েও গাঁজার নানা ব্যবহার প্রয়োগ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে ও'শনেসী ১৮৩৯ এ বার করলেন তাঁর গবেষণা পত্র, 'ওষুধ হিসাবে গাঁজার ব্যবহার'। ব্যথা কমাতে, মাংসপেশির সংকোচন রোধে বিশেষ করে টিটেনাস, জলাতঙ্ক প্রভৃতির খিঁচুনি কমাতে গাঁজার পরিমিত ব্যবহার কাজ দেয় বলে তাঁর ধারনার সবিশেষ প্রমাণ সহ। ১৮৪১ এ দু বছরের ছুটিতে ইংল্যান্ডে গিয়ে ও'শনেসী দেশী গাঁজাকে বিদেশী ওষুধ হিসাবে চিনিয়ে দিয়ে এলেন প্রধানত দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা কমাবার ওষুধ হিসাবে, যে পথ ধরে এখন চল হয়েছে স্নায়ু, মাংসপেশি, অস্থিসন্ধি সম্পর্কিত ক্রনিক ব্যথা, এমনকি ক্যান্সারের অন্তিম অবস্থার বেদনার উপশমে 'মেডিক্যাল মারিজুয়ানা' ব্যবহারের। ১৮৪৭ সালেই অবশ্য কলকাতায় ইথার, ক্লোরফরম দিয়ে অজ্ঞান করে অপারেশন শুরু হয়ে গেল। ততদিনে আরও দশটা গবেষণালব্ধ কাজের, ভারতীয় ফারমাকপিয়া থেকে ইলেকট্রিক ব্যাটারি তৈরি, মধ্যে তিনি কলকাতায় পেতে ফেলেছেন আমেরিকার বাইরে বিশ্বের দ্বিতীয় টেলিগ্রাফ লাইন, নিজস্ব নানা সংযোজনা ও উদ্ভাবনা সহ। ১৮৫২ সালে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়াবার সাথে লর্ড ডালহৌসি ও'শনেসীকে ভার দিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু করার। ৫৬ সালের মধ্যে ৪০০০ মাইল লাইন পেতে রানি ভিক্টোরিয়ার কাছে নাইটহুড পেলেন। ৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় তিনি ইংল্যান্ডে কিন্তু তাঁর তৈরি টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সিপাহিরা কানপুর, দিল্লী, পৌঁছবার আগেই সে খবর পৌঁছে দিয়ে, পাঞ্জাব থেকে গোরা রেজিমেন্ট আনিয়ে সিপাহিদের হারিয়ে দিল।

১৮৬০ সালে শেষবারের মত ইংল্যান্ড ফেরা এই আলেম সাহেব জীবনের শেষ ২৯টা বছর নিশ্চুপ, অলক্ষিত। শারীরিক অসুস্থতা নাকি গাঁজার ঠেক থেকে আহরিত কোন ভুয়ো দর্শন, কারণটা অজানা।